আধুনকি বাংলা গানের ভাষা

পবিত্র সরকার

'আধুনিক বাংলা গান' নামে যে চমৎকার সংকলনটি অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদনা করেছেন তাতে তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন এবং কাজী নজল ইসলাম— এই চারজন বরণীয় বাঙালি গীতস্রষ্টার গানও 'আধুনিক' বাংলা গানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এক হিসেবে তা সংগতও বটে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের চৈতন্যে আধুনিকতার১ উজ্জীবনের পর যেসব গানের রচনার পিছনে প্রধানত ধর্মীয় আবেগ ও ভক্তিপ্রাণতা নেই (যদিও ভক্তি ও আত্মনিবেদনস্রষ্টার ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী কিছু গানের উপাদান হতেই পারে), এমনকী প্রেমের গানেও রাধাকৃষ্ণের দৃশ্য বা অদৃশ্য উপস্থিতি আরোপের চেষ্টা নেই, যে- সব গানে জীবনের বহুবিধ অনুভব ও আবেগের এক মুক্ত আমন্ত্রণ আছে, এবং যে সব গান কখনও কখনও প্রবলভাবে ব্যক্তির নিজস্ব শৈলীর দ্বারা চিহ্নিত — সেগুলিকে আধুনিক গান বলা যেতেই পারে।

তবু আমরা অধ্যাপক চক্রবর্তীর আধুনিকতার পরিসর থেকে আর -একটু সংকীর্ণতর আধুনিকতার ধারণাকে গ্রহণ করব, অন্তত আধুনিক গানের ভাষাশৈলী বিচারের উদ্দেশ্যে। তার কারণ, নিছক শৈলীর জন্য না - হোক, সুর, বিষয় ও ব্যক্তিগত আবেগের নিজস্বতার জন্যও বটে, উপরিউক্ত চারজন স্রষ্টার গান এমনভাবেই তাঁদের নামের দ্বারা চিহ্নিত যে, সে গানগুলিকে আধুনিক গানের মূল স্রোতের অন্তর্গত করা অন্তত সাধারণ লৌকিক ধারণায় সম্ভব হয় না।২ আমরা এই লৌকিক বোধকে মান্য করেই রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত অতুলপ্রসাদ নজলের গানকে এই আলোচনার মূল অংশের বাইরে রাখব। এমন নয় যে, তাঁদের গানের প্রসঙ্গ সম্পূর্ন বর্জন করা সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে, কারণ আমাদের মনে হয়েছে, আমাদের চিহ্নিত এই আধুনিক বাংলা গানের শৈলীর মধ্যে মূলত দুটি তরঙ্গ আছে, এবং সে দুটি তরঙ্গের উৎস মুখে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ ও নজল। আমাদের দ্বারা প্রধানভাবে ব্যবহৃত দুটি সংকলনের৩ গানগুলি বিচার করে এমন কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু নজল নন, আবার শুধু রবীন্দ্রনাথও নন। একেবারে হাল আমল, আমাদের মতে গীতিকার সুমন চট্টোপাধ্যায়ের আগে পর্যন্ত, আধুনিক বাংলা গানের শৈলী প্রায় সার্বিকভাবে ওই দুই সংগীত পুষ নিয়ন্ত্রণ করে এসেছেন। এবং আধুনিক কবিতার ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা গানের ভাষার পার্থক্য ও দূরত্ব নির্মাণের পিছনেও দায়ি এই নিয়ন্ত্রণ। এমন নয় যে, পরবর্তী আধুনিক গানের রচয়িতারা ব্যক্তিগত ও অবিমিশ্রভাবে সকল সময়েই কেউ রবীন্দ্রপন্থী, কেউ নজলপন্থী। কেউ কেউ এমন অব্যাহতভাবে এমন হতেও পারেন, যেমন আমাদের (সীমাবদ্ধ নমুনা থেকে) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে মূলত রবীন্দ্রপন্থী মনে হয়েছে— কিন্তু অনেকেই কখনও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন, কখনও নজলকে। আবার একই গানের শরীরেও রবীন্দ্রনাথ নজলের যুগ্মতরঙ্গ মিশে গেছে, এমনও লক্ষ্য করা যায়। এরকম হওয়া খুবই সম্ভব, কারণ আধুনিক গানের অধিকাংশস্রষ্টাই মূলত গীতিসৃজনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেও আনন্দে গান রচনা করেননি ওই চার জনের মতো। অবশ্য ওই চতুঃস্রষ্টাও উপলক্ষ্য-নিয়ন্ত্রিত গান প্রচুর রচনা করেছেন, কিন্তু তবু গান রচনা তাঁদের স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশেরও এক গুত্বপূর্ণ অংশ, অনেকের মতে সবচেয়ে মূল্যবান অংশ ছিল। দ্বিতীয়ত, ওই চারজনই কথা ও সুরে সম্পূর্ণ এবং যুগনদ্ধ সৃষ্টি করেছেন, চারজনেই ছিলেন গীতিকার এবং সংগীতকার। আধনিক গানের রচয়িতারা অধিকাংশত তা নন, সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, পরেশ ধর ও হেমাঙ্গ ঝিাসকে বাদ দিলে। বস্তুত পক্ষে এই চারজনও আবার ওই প্রচলিত আধুনিকতার বৃত্তে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৃত্ত গড়ে তোলেন। গণসংগীতের এই উজ্জ্বল

স্রষ্টাদের সেই অর্থে আধুনিক বাংলা গানের ধারার অন্তর্গত বলে মেনে নিতে আমাদের একটু দ্বিধা হয়, যদিও ভাষাশৈলীর দিকথেকে তাঁদের সেই বিবেচনায় বাঁধা যেতেই পারে। দিলীপকুমার রায় আবার একটি পৃথক বৃত্ত গড়ে তোলেন। বাকি আধুনিক গানের রচয়িতাদের অনেকেই সংগীতচর্চা করতেন তা অধ্যাপক চক্রবর্তীর দেওয়া 'জীবনী-পঞ্জী' থেকে জানতে পারি। কিন্তু অধিকাংশই গান লিখেছেন অন্যের দেওয়া সুরের আশ্রয় হিসেবে, এবং গান লিখেছেন গ্রামোফোন রেকর্ড বা চলচ্চিত্রে মুদ্রিত হবে বলে। সেক্ষেত্রে তাঁদের উপলক্ষ্যের দাবি খেয়াল করেই গানটি লিখতে হয়েছে।

।। ২ ।।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাশৈলী সম্বন্ধে আমাদের অন্যত্র একটি আলোচনা আছে।৪ নজলগীতির ভাষা সম্বন্ধে আমরা একটি পৃথক আলোচনা প্রস্তুত করতে চলেছি। এই দুই গীতিকারের গানের ভাষাশৈলীতে বড়ো তফাত হল শব্দ নির্বাচনের। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দ ও শব্দবন্ধ, সমাস ইত্যাদি থেকে বলে দেওয়া যায় গানটি রবীন্দ্রনাথের না নজলের। শব্দ নির্বাচনের তফাত এই কারণেই হয় যে, বিষয় প্রেম প্রকৃতি ইত্যাদি মূলগতভাবে এক হলেও বিষয়টি সম্বন্ধে দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে একটি শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে এসে প্রায়ই স্থিত হতে চান, সেখানে নজল প্রায়ই একটু চপল ও উচ্ছল প্রকাশ পছন্দ করেন। ফলে 'বাগিচায় বুলবলি তুই ফুল- শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল' যেমন রবীন্দ্রনাথ কখনোই লিখতেন না, তেমনই নজল হয়তো লিখতেন না ' পদপ্রান্তে রাখো সেবকে'-র মতো দীর্ঘসমাসিত পদাবলির গান। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ যেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষা অবলম্বন করেছেন সেখানেও তাঁর ভাষাশৈলীতে একটি 'সাধুতা' ও সৌন্দর্যময় দুরত্ব অনেক সময় লক্ষ্য করি আমরা। নজল কখনও কখনও রবীন্দ্রসংগীতের এই শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত যে হননি তা নয়। তিনি আযৌবন রবীন্দ্রসংগীতে মুগ্ধ ছিলেন, রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াতে ছিল তাঁর প্রভূত আনন্দ— এই সব তথ্য থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, রবীন্দ্রসংগীত কখনও তাঁর কাছে একটি আদল বা মডেল হয়ে উঠেছিল। কখনও কখনও ভাষাভঙ্গির ক্বচিৎ অনুসরণ হয়তো দেখা যায়, যেমন,—

কেন কী কথা স্মরণে রাজে?
বুকে কার হতাদার বাজে?
কোন্ ক্রন্দন হিয়া-মাঝে
উঠে গুমরি ব্যর্থতাতে,
আর জল ভরে আঁখিপাতে।

কিন্তু মুগ্ধতার এই বিপদ সম্বন্ধে নজল নিশ্চয়ই অতি দ্রুত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, ফলে নিজস্বতার একটি মুদ্রণতৈরি করতে তাঁর বেশি দেরি হয়নি। নজলের এই নিজস্বতার ছিল দুটি দিক। একটি হল তার গানে অর্ধতৎসম তদ্ভব ও আরবি-ফার্সি-লৌকিক শব্দের আধিক্য; অন্যটি হল তাঁর গানের একটি অতিরিক্ত আবেগ, যাকে ইংরেজি 'সেন্টিমেন্টালিটি' কথাটি ব্যবহার করে বোঝানো চলে, যার ফলে তার গানে খানিকটা অতিরিক্ত 'নাটকীয়তা'র সৃষ্টি হয়। যেমন 'বসিয়া বিজনে কে গো একা মনে' গানের শেষ অংশে দুয়েরই চিহ্ন আছে—

ও গো বে-দরদি ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে!
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি।

নজলের এই সব শব্দগুলির, এই 'লো' গো ইত্যাদি সম্বোধনসূচক শব্দখন্ডের বহুল প্রয়োগ তাঁর গানের এমন কতকগুলি লক্ষণ সৃষ্টি করেছে যা অন্যদের মতো নয়। অন্যদিকে, সাধারণভাবে বলতে গেলে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গন বাংলা গীতি সাহিত্যে অনন্য উদ্ভাবন হলেও তাঁর অন্যান্য গান উনবিংশ শতাব্দীর বৈঠকি গানে, কিছুটা রবীন্দ্রনাথের যৌবনের গীতরচনা শৈলীগত দোসর।

৩নং এর কিছুটা বাদ আছে এটা পড়ে টাইপ করা হবে
হেমেন্দ্র কুমার রায় প্রতিবেশ- বদ্ধতার মধ্যেও কিছুটা দুঃখের ব্যাপ্তি এনেছেন। সেখানে প্রতিবেশটি সীমা, বেদনা তাকে অতিক্রম করে। অন্যদিকে এরকম আর-একটি দৃষ্টান্ত 'নরক গুলজার' নাটকে দেবাশিস দাশগুপ্তের গানে প্রতিবেশই শক্তি, তা গানের বিশেষ রসটিকে তৈরি করে দেয়—
কথা কোয়ো না, কেউ শব্দ কোরো না,
ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন,
গোলযোগ সইতে পারেন না।

ফলে আমরা যখন আধুনিক গানের ভাষাশৈলী বিচার করতে বসি, তখন এই সব অবস্থা-ও চরিত্র-বদ্ধ নাটক ও চলচ্চিত্রের গান আমাদের কাজকে বেশ দুরূহ করে তোলে। একজন স্বতঃস্ফূর্ত ও নিছক সাংগীতিক আত্মপ্রকাশকামী গীতরচয়িতাদের সৃষ্টির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা থাকে না। বস্তুতপক্ষে বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক সূত্র অনুসরণকারী অজয় ভট্টাচার্যের অন্যান্য গানের সঙ্গে এই কারণেই 'একটি পয়সা দাও গো বাবূ' গানের কোনো মিল নেই। এটি তাঁর ব্যক্তিত্ব বা গভীরতর হৃদয়ানুভবের প্রকাশ নয়। আর এ ধরনের গানকে আলোচনার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করলে আম াদের ক্ষেত্র অনেক বেশি বিস্তীর্ণ হয়ে পড়বার আশঙ্কা তৈরী হবে। তা সত্ত্বেও শুধু প্রেম, প্রার্থনা, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম, গণবিপ্লব, বা জীবন সম্বন্ধে দার্শনিকতা ইত্যাদি—এই কটি বিষয়ের মধ্যে যে আধুনিক গান সীমাবদ্ধ নয় তাও আমাদের মনে রাখতে হবে। কিন্তু এই বিষয় বা থিম্‌গুলি প্রধান, বিশেষত প্রেম খুব প্রত্যাশিতভাবেই আধুনিকগানে তার সাম্রাজ্য বিস্ত ার করে আছে। প্রার্থনা বা প্রকৃতির গান সেতুলনায় অনেক কম। রজনীকান্তের পর প্রার্থনা বা অন্যান্য ভক্তিগীতি অনেক ক্ষেত্রেই ফরমায়েসি রচনা, এমনকী নজলের অধিকাংশ রচনাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিছু চলচ্চিত্রের প্রতিবেশবদ্ধ রচনা, যেমন 'মেজদিদি' ছবিতে কানন দেবীর গাওয়া 'প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম।' প্রকৃতি পৃথক মনোযোগের লক্ষ্য হয়েছে ক্বচিৎ-কদাচিৎ, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমের পটভূমি হিসেবে গণ্য, যেমন হেমেন্দ্র কুমার রায়ের —
আঁখি তুলে চাও আমার পানে।
আকাশ এখন কবিতায় ভরা কোকিল সুরের স্বপন আনে।
দখিন বাতাসে বাজে বীণা বেণু, জোছনায় নাচে মানিকের রেণু,
মরমে এনো না শরমের ছায়া বিজলী ছুটাও নয়নবাণে ।।

আবার প্রেম, ভক্তির আবেগ বা প্রকৃতিবিষয়ক গান ইতিহাসবদ্ধ নয়, তা কোনো দেশের কোনো বিশেষ সময় বা অবস্থার সঙ্গে যুক্তনয়। কিন্তু স্বদেশপ্রেম ও গণবিপ্লবের গান সময়বদ্ধ, বিশেষ কালসীমা ও সামাজিক সূত্রের দ্বারা চিহ্নিত। ফলে স্ব দেশচেতনা ও বিপ্লববোধের গানগুলির শৈলীতে সেই সাময়িকতা ও সামাজিক পরিচয় মুদ্রিত। আবার বাংলায় বা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি আকাঙ্খার আশ্রয় যে স্বদেশপ্রেম আর বহুশতাব্দীর শোষন ও পীড়নের বোঝা ও শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য সর্বহারা যে প্রবল ইচ্ছা--তার মধ্যেও প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ ও শৈলীগত তফাত তৈরি হয়ে যায়।

আমাদের মতে আধুনিক বাংলা গানে বিষয়ই তার ভাষাশৈলীর প্রধান নিয়ন্তা, রচয়িতার ব্যক্তিত্ব নয়। গৌণ নিয়ন্তা ওই ধরনের গানে রবীন্দ্রনাথ বা নজলের মতো মহৎস্রষ্টাদের শৈলী যা অন্য গীতিকারেরা অনেক সময় অনুসরণ করতে প্রলো ভিত হয়েছেন। ফলে আমাদের আলোচনা হবে মূলত বিষয়নির্ভর। তার আগে গানের রূপবন্ধ বিষয়ে দু-একটি কথা বলে নিতে হবে।
।। ৪ ।।
রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের যে চার তূকের কাঠামোটি তাঁর গানে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, আধুনিক গানে তা সাধারণভাবে অনূসৃত হয়েছে, যদিও তা থেকে বিসর্পনের দৃষ্টান্তও কম নেই। অর্থাৎ আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগের ছকটিই বেশির ভাগ গানে অনুসরণ করা হয়েছে। আস্থায়ীতে দুটি সমিল ছত্র, অন্তরাতে দুটি সমিল ছত্র খন্ড এবং শেষেত্রিপদীর তৃতীয়

পদের ধরনে একটি অস্থায়ীর মিল বহনকারী ছত্র। সঞ্চারীতে আবার নতুন মিলের দুটি ছত্র, এবং আভোগে অন্তরার ছকের অনুসরণ। অনেকটা এইরকম (ক খ ইত্যাদি মিলের সূচক)—

— — — —ক
—— — — —ক
— — খ— ——খ
— — — — —ক।।
———————গ
———————গ।
—————ঘ————ঘ
——————————ক।।

ছত্র সজ্জার এদিক-ওদিক করে কোথাও কোথাও গানের চেহারা একটু ভিন্ন হয়েছে, কোথাও খন্ডছত্রের বদলে সমিল পূর্ণছত্রই দেখা গেছে।

ব্যতিত্রম ঘটেছে মূলত গাথা-গানে— যেমন 'এমনই শারদ রাতে সাতটি বছর আগে।' (জগন্ময় মিত্রের গাওয়া), কিংবা 'গাঁয়ের বধূ'

(সলিল চৌধুরী) ইত্যাদি গানে, কিংবা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গাওয়া দীর্ঘ দেশপ্রেমের উদ্দীপনাযুক্ত গান 'সূর্যলোকের দেশ গাহে আজ সুর্যোদয়ের গান' (শৈলেন রায়)। বিশেষত দিলীপ কুমার রায়ের গানগুলি রূপবন্ধ রচনায় এক ধরনের স্বচ্ছন্দ স্ব াধীনতার নিদর্শন। সলিল চৌধুরীও কখনও কখনও বিদেশী ব্যালাডের পুনরাবৃত্তিময় রূপবন্ধ নির্মাণ করেছেন, যেমন, 'ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধুলিতে' গানটিতে। যে মার্কিন ব্যালাড 'John Braun's body lies amouldering in the grave'(আরও পরিচিতভাবে ' Glory glory Haleluja ') থেকে তিনি সুরের ধাঁচটি গ্রহণ করেছেন তাতে এই পুনর াবৃত্তিময় অনুচ্ছেদ বা তুক আছে। সলিল চৌধুরীর একই সুরকে মন্থর ও দ্রুত করে তারও মধ্যে অতিরিক্ত তরঙ্গভঙ্গ তৈরি করেছেন, এবং সেক্ষেত্রে পুনরাবর্তনের মধ্যেও বৈচিত্র এসেছে। আবার কীর্তনের বিশেষ ঢং নিয়ন্ত্রিত করেছে 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা' গানটির রূপবন্ধকে। বিনয় রায়ের গানের মধ্যেও রূপবন্ধের এই বিস্তার আছে।

।।৫ ।।

বহু ধরনের গানে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় থেকে রাবীন্দ্রিক রচনাভঙ্গি ও অনুষঙ্গ খুবই অব্যাহত এক ধারাবাহিকতা ল াভ করেছে, তা দুটি সংকলনগ্রন্থ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আমরা পরপর কিছু উদ্ধৃতি তুলে তা দেখাবার চেষ্টাকরি—

ফিরে তুমি আসবে না,
তবু আমি তোমায় ডাকি।
আমার মনের বিজন ঘরে
দুয়ারখানি খুলে রাখি।
নিত্য ফুলের মালা গাঁথি,
ঘরে জ্বালি গন্ধবাতি,
পথ ভুলে আস যদি
বাতায়নে চেয়ে থাকি।।

সৌরীন্দ্রমোহন
তোমার আসার পথে আমার আঁখি দেবে আঁকি
তৃষার আলিপন।
আমার ব্যথার বুকে তোমার আমন্ত্রণ।।
যখন নিশীথ রাতের শশী একলা বসি কণ চোখে চাহে
অলস পাখি উদাসগীতি গাহে,
তখন আমার হিয়ায় তোমার পূজার আয়োজন।
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কোন্ লাবণ্যলীলায় ভরা
জাগে আজ এই বসুন্ধরা!
কোন্ সুদুরের আলো এল
কালো ছায়ার 'পরে !
(সে যে) স্বপ্ন-পরিজাতের সোনার
রেণুর মতো ঝরে।।

দিলীপকুমার রায়

না জানি কী বাণী আজ শুনি।
তব গানে কী বারতা
কী ব্যথা আকুলতা,
সুরে সুরে আজি হে গুণী।
তুলসী লাহিড়ী

ওগো সুন্দর, মনের গহনে তোমা মুরতি খানি
ভেঙে ভেঙে যায় বারে বারে,
বাহির বিশ্বে তাই তো তোমারে টানি।।
সজনীকান্ত দাস

শেফালি তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদ-প্রাতে,
চরণে চরণে তোলো রিনিরিনি অরখ-বরন(?) হাতে। নিশির শিশিরে অবগাহি, যাপিয়াছ কার পথ চাহি,
মৃদুল হিল্লোলে—অলসে পড়িলে ঢলে ঢুলু ঢুলু নয়নপাতে।।

হীরেন বসু
হারা ম-নদী, শ্রান্ত দিনের পাখি,
নিবু নিবু দীপ, আর্ত-আতুর নহ একাকী।
সাগর কিনারে কণার তীরে
জীর্ণ তরীরা যেথা গিয়ে ভিড়ে
সে মহামেলার বেদনাতীর্থে আজিকে তোমায় ডাকি ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যে ফুল আমারে দাও
সে কি তব প্রভাতের হাসি।

তোমারে কী দিব দান,
তব লাগি আছে মোর বাঁশি।।

শৈলেন রায়

চৈত্রদিনের ঝরাপাতার পথে
দিনগুলি মোর কোথায় গেল, বেলা শেষের শেষ আলোকের রথে।।
নিয়ে গেল কতই আলো, কতই ছায়া
নিল কানে-কানে ডাকা নামের মনে-মনে-রাখা মায়া।
নিয়ে গেল বসন্ত সে।
আমার ভাঙা কুঞ্জশাখা হতে।।

অজয় ভট্টাচার্য

আজি বসন্ত জাগিল কুঞ্জ দ্বারে
নিয়ে ফুলভারে।
রচি গন্ধের অঞ্জলি মঞ্জুলিকায়
নব পত্রালিকায়
গাঁথি বরণহারে।।

বাণীকুমার

ক্ষণেক ছায়াতলে
বসিয়া গেলে তুমি
সেদিন ফুলছায়
ছিল এ বনভূমি।

সুবোধ পুরকায়স্থ

কত যে ফুল রাখি আমি
পুজার থালায় তব,
কত যে সুর বাঁধি বীণায়
ছন্দ নব নব—
তবু সাড়া পাই নে তোমার,

নীরব থাক বন্ধু আমার,
আমার কণ্ঠ নীরব হলে
আসবে অভিসারে।।

অনিল ভট্টাচার্য

আমরা তোমার জ্যোতির শিশু যত,
ধুলার খেলায় ছিলাম তোমার ভুলে,

মাটির সাথে ছিলাম মাটির মতো
শিখার মতো আজ উঠেছি দুলে।

নিশিকান্ত

ফুলের সুরভি মায়া
উদাসী হাওয়ায় মন ভরে দেয়, অরণ্যে কাঁপে ছায়া।
তণ আলোয় ব্যথিত প্রেমের কমলিকা মুখ ঢাকে।।
ও গো প্রেম, তুমি স্বপনের মায়ামৃগ,
আজো বনপথে মায়া-হরিনীর ঠিকানা পেলে না কি গো?

বিমলচন্দ্র ঘোষ

কেন এ হৃদয় নিজেরে লুকায়ে চায়—
মুকুল যেমন আপনারে ঢাকে বনপল্লব ছায়।
আপনারে কেন অঞ্জলি সম
পারি না তোমারে দিতে প্রিয়তম,
অন্তরে মোর কত ফুল ফোটে
নীরবেই ঝরে যায়।।

সেই ধরণী ধুসর ক'রে ফুল ঝরায়ে দেবে,
যে দিল মোর কণ্ঠসুধা সেই তা কেড়ে নেবে।
সেদিন আমার রেখে-যাওয়া গানের বাঁশি দেখে
নতুন কোনো বাঁশুরিয়ায় নেবে সবাই ডেকে.....
শ্যামল গুপ্ত

মোর অশ্রুসাগর-কিনারে রয়েছে বেদনার এই খেয়া,
পথ-চাওয়া আঁখি তবুও নিমেষহীন—
আজ নেই শুধু সেই সে হারানো দিন।।

গন্ধের ভারে মন্থর বায়ু অন্তর ছুঁয়ে যায়
মনে হয় শুধু হায়
সব কিছু ভুলে হায় তুমি আজ উদাসীন।
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

এই রাবীন্দ্রিক শৈলী প্রকাশিত হয় বিশেষ বিশেষ পদ- সমাবেশে, সমাসে এবং অলংকার- অনুষঙ্গে। 'মাধবী শাখে', 'দখিন বাতায়ন', 'শ্যামল ছায়া', 'ফাগুন-সমীরণ' 'অলকার কোন্ মালবিকা' 'বিজন ঘরে', 'বাসন্তিকার গলায় দোলে' 'যার অ ারতি চন্দ্র করে', 'মহা ওঙ্কার', 'নিত্যকালের বাণী' 'আরতি-দীপ', 'শারদ প্রাতে', 'বিফল রাতি', 'চুকবে.... সকল দেয়া- নেয়া', 'হারা ম-নদী', 'যৌবনেরই বীণার তারে', 'হে নিপমা ..... করিয়ো ক্ষমা', 'ঝর ঝর বরিষণে', 'রূপের বিভা', 'ফ াগুন দিনের আশা', 'জীবন-নাথ', 'জ্বলল দিনের চিতা', ইত্যাদি অজস্র শব্দবন্ধআধুনিক গানে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিত ার বিশেষ বিশেষ প্রকাশনার স্মারক হয়ে শুধু দেখা দেয় তা নয়, গানের বস্তুও অনেক সময় কোনো- না- কোনো রবীন্দ্রসংগীতের সূত্র থেকে নির্মিত হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতার প্রতিধবনি জেগে ওঠে শৈলেন রায়ের 'প্রেমের সমাধিতীরে' গানটিতে। কখনও কখনও একই কথাবস্তু নানা গানে প্রকটিত হয়। যেমন, প্রণব রায় 'তুমি জীবনে য ারে কভু দাওনি মালা/মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল?' লিখেছেন, তিনিই আবার লেখেন 'কেন আগের মতন কাছে এসে/মোর মুখপানে ফিরে ফিরে চাও/ যারে বিদায় দিয়েছএকদিন/ তুমি যেতে দাও তারে যেতে দাও'। অর্থাৎ শুধু অন্যের অনুসরণ নয়, কখনও কখনও নিজের অনুসরণও দেখা যায় আধুনিক গানের সজ্জায়।

এর অর্থ এই যে, আধুনিক গানের রচয়িতারা সকলেই মৌলিকতাহীন অনুসরণকারী মাত্র। আমরা শুধু এটুকুই বলতে চ াই যে, আধুনিক গানের সৃজন বিশ্ব রবীন্দ্রনাথ এমন এক সর্বাতিশায়ী অস্তিত্ব যে তাঁর গান বা কবিতার নানা উপাদানের অন্তর্বয়ন আধুনিক গানে অনায়াসেই ঘটে যায়। তা থেকে সহজ নিষ্কৃতির পথ হল সচেতনভাবে অন্য কোনো আদলের শরণাপন্ন হওয়া। এই রকম একটি আদল, বলা বাহুল্য, নজল ইসলাম। এই আদলের আভাস আসে হেমেন্দ্র কুমার র ায়ের এই গানে—

বঁধু চরণ ধরে বারণ করি টেনো না আর চোখের টানে।
তোমার পিচকারিতে রং-ঝারিতে কী গুণ আছে ননদ জানে।।
কিংবা আরও নানা গীতিকারের রচনায়—

এল কে এল রে মোর রঙ মহালের আঙিনাতে,
এল রে এল কে ওই ফুল ছড়িয়ে পাগলা হাতে,—
হাসিয়ে হাসনুহেনায় চোখ-ইসারায় জ্যোৎস্না-রাতে!
কেন লো শিউরে উঠি' শিউলি কোমল শয্যা পাতে,
বকুলে আকুল কেন কোকিল সখী, ওই ফুকারে!
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মানুষ এখানে অশুচি হয়েছে,
পবিত্র হেথা মাটি-পাথর,
জন্মের গুণে কেউ উঁচু শির,
কেউ সেই দোষে ভয়কাতর।
সজনীকান্ত দাস

পসরা বহি শিরে সখী কি চাইবে ফিরে,
গোপনে নিলাজ আঁখি চাবে কি ঘোমটা চিরে?
সোহাগের গরব হাসি পড়বে খসি — সখী
লুটিয়ে দেবে চরণতলে পূজার ডালি
নয়নতীরে— যমুনার তীরে।
হীরেন বসু

কেন ঘোমটা দিয়ে মুখ লুকালি,
এল যে তোর বর;
ওযে বাঁকা ভুর ধনুর টানে ছড়ায় ফুলশর

শৈলেন রায়
স্বপন দেখি প্রবাল দ্বীপে
তুলব আমি বাড়ি;
সাগর থেকে ঝিনুক এনে তিন-মহলা বাড়ি।
গাঁথব সোপান তারি—
আমার তিন-মহলা বাড়ি।
অজয় ভট্টাচার্য

আমরা আগেই বলেছি যে অবিমিশ্র ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কেউ রবীন্দ্রনাথ বা নজলের প্রভাব আত্মস্থ করেছেন এমননয়। কোনো গানে উপলক্ষ্যহেতু— চলচ্চিত্রে ওই উপলক্ষ্য ওই ধরনের শৈলী দাবি করেছে বলে— হয়তো শৈলীবদল ঘটেছে।

এই দুই শৈলী থেকে দূরে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিজের আদল ছিল মূলত লোকসংগীত, বাংলার গ্রামীন পরম্পরার গীতবন্ধ, কীর্তন, বাউল ও অন্যান্য রূপ।ফলে তাঁর গানে রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন তিনি পরম্পরার যৌথ আবেগ থেকে সরে এসে একটু ব্যক্তিগত আর্তির কথা উচচারণ করেছেন, 'কবি'-র এই গানটিতে—

এই খেদ মোর মনে,
ভালোবেসে মিটিল না সাধ—
কুলাল না এ জীবনে।
জীবন এত ছোট কেনে।

তখন ওই গ্রামীণ ভাষায় আশ্রিত লোকগীতির শৈলীই তাঁর গানের প্রবল শক্তি হয়ে ওঠে ।
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আবার কখনও নজল-সম্ভাব্য উৎসাহ—
উদয় পথের যাত্রী
ওরে রে ছাত্রছাত্রী,
মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো।

প্রেতপুরীর এই অন্ধকারায় আনো আলো।
হেমাঙ্গ বিশ্বাস

আবার কখনও লোকজীবনের ভাষা এসে দখল নেয়—

ফিরাইয়া দে, দে, দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে।
মালাবারের কৃষক সন্তান, (তারা) কৃষকসভার ছিল প্রাণ,
অমর হইয়া রহিবে তারা দেশের দশের অন্তরে।।
বিনয় রায়

সলিল চৌধুরীর গণসংগীত তখনকার সমসাময়িক প্রগতিশীল কবিতায়, বিশেষত সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার ভাষার প াশাপাশি পথ হেঁটেছে, আবার কখনও লোকসংগীতের ভাষাকে গ্রহণ করেছে। অনুমান করি, অনেক সময় সুর তাঁর ভাষ াশৈলীর সূত্র নির্ধারণ করেছে। 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা'তে লোকসংগীত এ গানের ভাষাবন্ধনকে লোক-উচ্চারণের নৈকট্য দিয়েছে। সলিল চৌধুরীর কোনো কোনো গানে রাবীন্দ্রিক স্মৃতিও জেগে ওঠে—

মাঝে মাঝে উদাস হাওয়ায় এলোমেলো কী যে শুনি,
বুঝি কাহার ব্যথার ছোঁয়ায় হারায় আমার সুরের ধ্বনি,
ঝড়ের হাওয়ায়, পাতার মতন ঝরিয়া যায়—
।।৬ ।।
আধুনিক গানের ভাষা যে আধুনিক কবিতার ভাষার সঙ্গে সমান ছন্দে এগিয়ে যেতে পারেনি, তার একটা কারণ বোধ হয় ছিল এই আদলগুলি। আধুনিক কবিতা প্রথম থেকেই শৈলীতে রবীন্দ্রনাথ বা নজলের প্রভাব অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছে, এবং অন্তত একজন কবি এ বিষয়ে বেশ আত্মসচেতন হয়েই এ সংক্রান্ত একটি 'প্রোগ্রাম'-এর কথাও ভাবতে পেরেছিলেন। এঁদের পুরোধা ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর 'দয়মন্তী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯৪৩) একটি পরিশিষ্ট-নিবন্ধ (পৃ. ৭১ -৮২)। তিনি সেখানে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, কবিতা রচনায় আর তিনি " বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত" হবেন না, এবং তিনি সাধু ক্রিয়াপদ 'হইব' 'বলিব' বা কাব্যিক ক্রিয়াপদ 'ফুটি' 'চলিছে', কাব্যিক অন্যান্য শব্দ 'মম' 'কভু' 'যেথা' 'নারি' ইত্যাদি প্রয়োগ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করবেন।৬

নানা কারণে ওই কাব্যগ্রন্থের সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর সংকল্প রক্ষা করতে না পারলেও, নিজের ভাষাশৈলী বিষয়ে আধুনিক কবিতা যে একটি নতুন প্রস্থান গড়ে তুলতে চাইছে তা বুদ্ধদেব বসুর এই নিবন্ধ থেকেই স্পষ্ট। তাই আমরা লক্ষ করি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলা গল্প-উপন্যাসে যেমন চলিত বাংলাভাষা আস্তে আস্তে গৃহীত হচ্ছে সাধু গদ্যকে বিদ ায় দিয়ে, তেমনই বাংলা কবিতাতেও চলিত ভাষা আস্তে আস্তে নিজের স্থায়ী ভূমিকা নিতে আরম্ভ করেছে— বিশেষত বুদ্ধদেব ছাড়াও সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অণ মিত্র প্রভৃতির কবিতায়— তাও আমরা লক্ষ করি। জীবনানন্দ আবার সচেতনভ াবেই একটু প্রাক্তন ভাষার স্মৃতি জাগিয়ে রাখেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু অন্যান্যদের কবিতায় উপমা রূপকের মধ্যেও, আরও নানা অলংকরণের মধ্যে ফুটে ওঠে আধুনিক জীবন, সমাজ ও পৃথিবীর নানা অনুষঙ্গ।

কিন্তু আধুনিক গানে এই ভাষা ও অলংকরণ কিছু প্রাক্তন সূত্রকেই আঁকড়ে ধরে থাকায় বিষয়টি দীর্ঘদিন বজায় থাকে। ফলে তাতে একেবারে শ্যামল গুপ্ত৭ পর্যন্ত এ ধরনের শব্দাবলির ব্যবহার দেখি—

কাজল চোখ, মধুমায়া, লুটায়ে, মাধবীরাতে, মাধুরী, গোপন ব্যাথা, মধুমাস, দখিন বাতাস, মিলাতে, স্বপন, মিলনের লগ্ন,

মন-যমুনা, গরব, লাজ, সিনান, গাগরী, ফাগুনের সোনালি হাসি, গানের মিনতি , নয়ন, মধুবন, ভাঙা আশা, ঝরায়ে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারে পাই—

পান্থপাখি, কূজন-কাকলি, রাখালি বাঁশি, পরাগ-ঝরানো, স্বপ্ন- ভরানো, ভ্রমর, নাই, হায়, সেথায়,কভু, বকুল, লগন, মৌমাছি,

আঁকি, নিমেষ-হারা, আঁখিজল, দুয়ার-প্রান্তে, আঁধার, আলেয়া, মরীচিকা, অশ্রুসাগর, পথ-চাওয়া-আঁখি, প্রণয়ের মধু, মৃণাল-বাঁধন, চিরবেদনা।

অর্থাৎ চল্লিশের বছরগুলির গোড়া থেকে আধুনিক কবিতা ও আধুনিক বাংলা গানের ভাষার দুরত্ব ক্রমশ বিস্তারিত হতে শু করে, এবং প্রায় তিন-চার দশক জুড়ে এই ব্যবধান এক সেতুবন্ধহীন বিশাল অপরিচয়ের মতো চেহারা নিতে থাকে।

কবে থেকে এই দুরত্ব কমাবার চেষ্টা হয় তার কোনো তথ্যঋদ্ধ বিবরণ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আধুনিক কবিত ায় সুর দেওয়ার চেষ্টাও অধিকাংশত ব্যর্থ হয়েছে বলে আমাদের ধারণা, কারণ আধুনিক কবিতার ভাষা প্রচলিত অ াধুনিক গানের সুরের ছকে ঠিক সাড়া দিতে চায়নি। বস্তুত দুয়ের ভাষা বা বন্ধ সম্পূর্ণ এক হওয়ার কথাও নয়। গানের ভ াষা সুরবাহিত এবং তালবদ্ধ হবে বলেই তার প্রকরণ এবং ছাঁদ কিছুটা আলাদা হবে। কিন্তু তাতে সেই কারণে সাধু বা কা ব্যিক শব্দ, 'গো', 'লো', ইত্যাদি সম্ভাষণ পদ সেইজন্য বজায় রাখতে হবে, তার কোনো অর্থ নেই। মনে পড়ে সম্ভবত সত্তরের বছরগুলিতে মান্না দে-র গাওয়া 'চার দেওয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে/ সাজিয়ে নিয়ে দেখছি বাহির ঝিকে' শুনে একটু চমকে উঠে ভেবেছিলাম, তবে কি কথার আধুনিকতা আস্তে আস্তে উঠে আসছে? এই ভাবেই সুবীর সেনের একটি গ ানের মুখ সম্ভবত ছিল 'হাতে হাতে হাতঘড়ি বাঁধা।' দুঃখের বিষয় এ গানগুলির রচয়িতাদের নাম মনে নেই। তারই কাছ াকাছি সময়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় মুকুল দত্তের দুটি গান— 'তুমি এলে, অনেকদিনের পরে যেন বৃষ্টি এল', এবং 'তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা' শুনেও এইভাবে আশান্বিত হয়েছিলাম। বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'র অংশ নিয়ে সলিল চৌধুরীর অসামান্য সংগীত সৃষ্টির সাফল্য অবশ্য খুব একটা পুনরাবৃত্ত হয়নি।

তবে একেবারে সাম্প্রতিককালে বাংলা গানের কথাকে আমাদের জীবন ও সমসাময়িকতার সঙ্গে জুড়ে দেবার কাজে পথপ্রদর্শক সম্ভবত সুমন টট্টোপাধ্যায়। সুমন আমাদের দৈনন্দিনতার মধ্যে কবিতা ও সুরকে ডেকে এনেছেন এবং তাঁর গ ানে প্রাচীন সাধু ভাষার শব্দ, কাব্যিক শব্দ ও পদখন্ড প্রথাগত অলংকার ইত্যাদি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। ফলে নীচের এই গ ানটি আধুনিক কবিতার অনেক বেশি কাছাকাছি—
ভরসা থাকুক টেলিগ্রাফের তারে বসা ফিঙের ল্যাজে,
ভরসা থাকুক চালে ডালে তেলে নুনে আর পেঁয়াজে।

ভরসা থাকুক ফড়িং হয়ে উড়ুক নাচুক বাঁচার তালে,
ভরসা থাকুক হাতটিতে ভরসা থাকুক ছোলার ডালে।
ভরসা থাকুক জ্বরের ঘোরে মুড়ি দেবার গায়ের চাদর,
ভরসা থাকুক গাছের পাতায় পাতায় রোদের স্বচ্ছ আদর ।
ভরসা থাকুক মুড়কি মুড়ি নকুলদানা আর বাতাসা,
ভরসা থাকুক আরো বিরল চাকরি পাবার জ্যান্ত আশা।৮
কিন্তু এ গানকে আধুনিক কবিতার চিন্তা, কল্পনা ও প্রকাশগত দুর্বোধ্যতাকে পরিহার করতে হয়েছে, তার কারণ আধুনিক

কবিতার পাঠক আর এ গানের শ্রোতা একটি অখন্ডদলের অন্তর্গত নন। বেশ কিছু মানুষ দুয়েরই আস্বাদন পান, কিন্তু প াঠ্য কবিতা আর শ্রাব্য গানের লক্ষ্য যে- জনগোষ্ঠী, তা পৃথক হতে বাধ্য। এ গানের শ্রোতার মধ্যে আধুনিক কবিতায় অ-রসিক, এমনকী নিরক্ষর মানুষও থাকবেন, এই হিসেব ধরে নিয়েই সুমন ও তাঁর অনুসরণকারীদের গানের কথাকে বোধ্যত ার গন্ডির মধ্যে রেখে দিতে হয়।

তবু আমাদের মতে সুমন টট্টোপাধ্যায়ই আধুনিক গানের কথা ও সুরে প্রথম বিপ্লব সমাধা করেছেন। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, প্রচলিত ধরনের আধুনিক গান আর লেখা হচ্ছে না বা হবে না। গান রচনা বিষয়টি ব্যক্তিগত, এবং ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ও পরিকল্পনা যেমন, তেমনই ব্যক্তির উপর নানাধরনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফলেই তাঁর রচনাশৈলী তাঁর নিজের চিহ্ নিয়ে গড়ে ওঠে। ফলে সকলেই সুমনের মতো লিখতে শু করবেন তা না হওয়াইস্বাভাবিক; পরম্পরার প্রভাব এখনও অব্য াহতভাবে অনেকদিন স্থায়ী হবে। কিন্তু সুমনই বাংলা গানের ভাষাশরীরেরকাঠামো সম্পূর্ন নতুন করে নির্মাণ করেছেন, এবং পরে তাঁর পথ ধরে অন্যরাও কেউ কেউ অগ্রসর হয়েছেন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. আমাদের সাহিত্যে ‘আধুনিক’ কথাটির একাধিক অর্থ তৈরী হয়েছে তা সকলেই জানেন। একটি বড়ো দ্ব্যর্থকতার ক্ষেত্র আধুনিকতার সময়সীমা নিয়ে— কোন্ সময়ে এর শু, কোন্ পর্যন্ত এর বিস্তার। আধুনিকতার দেশগত চরিত্র নিয়েও প ার্থক্য আছে। মোহিতলাল মজুমদারের ‘আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য’ এর আধুনিক আর রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্যের পথে’র “ আধুনিক কাব্য”-এর আধুনিক আর এক নয়। রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা পাশ্চাত্যের কবিতা বা ইঙ্গ-মার্কিন কবিতায় আশ্রি ত, মোহিতলালে তার আশ্রয় বাংলা সাহিত্য। আবার আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর ‘আধুনিক’ এবং বুদ্ধদেব বসুর ‘আধুনিক’ মোহিতলালের ধরনেই শুধু কাল নয়, দেশের দ্বারাও সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তা কেবল বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আবদ্ধ, কিন্তু আইয়ুবের ধারণা রবীন্দ্রনাথকে বাইরে রাখে, বুদ্ধদেবের ধারণা তা রাখে না (‘রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম আধুনিক তো রবীন্দ্রনাথ’— এই হল বুদ্ধদেবের ধারণা)। বাংলা ‘আধুনিক’ কথাটির অর্থবস্তু নিয়ে একটি নিয়ে একটি আলাদা বিচার বিশেষ চিত্তাকর্ষক হবে সন্দেহ নেই ।

২. আকাশবাণীতেও এখন এঁদের গানগুলি এঁদের নামের দ্বারা চিহিত— রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদের গ ান, রজনীকান্তের গান ও নজলগীতি হিসেবে।

৩. সুধীর চত্রবর্তী (সম্পা), ১৩৯৪, ‘আধুনিক বাংলা গান’, কলকাতা, প্যাপিরাস, এবং স্বপন সোম (সম্পা), ১৯৯৮, ‘গ ানের ভিতর দিয়ে’, কলকাতা, প্রজ্ঞা প্রকাশন।

৪. দ্র. এই লেখকের ‘গদ্যরীতি পদ্যরীতি’, কলকাতা, সাহিত্যলোক ১৪ -৪২ পৃ.

৫. এ থেকেই বোঝা যাবে যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মুখে যেমন শুনেছিলাম—আধুনিক গান লিখতে হলে যুত্তব্যঞ্জন ব্যবহার করা যাবে না— তাঁর বন্ধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁকে একসময় এরকম বলেছিলেন— তা সব সময় সত্য নয়। বিশেষত উদ্দীপনার গানে যুত্তব্যঞ্জন বিশেষ একটি দৃপ্ততার ধবনি জাগায়। সজনীকান্ত দাস, মোহিনী চৌধুরী প্রভৃতি সকলেই বাংলার সেই প্রথাগত শৈলীই গ্রহণ করেছেন। সম্ভত এ শৈলীর শু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চল্ রে চল সবে ভারত সন্তান’ থেকে।

৬. ‘দয়মন্তী’, কবিতা ভবন প্রকাশিত । এ সম্বন্ধে ‘গদ্যরীতি পদ্যরীতি’তে এ লেখকের “কবিতার ভাষা, বাংলা কবিত

া”(পৃ.১-১৩) প্রবন্ধটিও দেখা যেতে পারে।

৭. শ্যামল গুপ্ত, ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারই সুধীর চক্রবর্তীর সংকলনে ‘তণতম’ গীতিকার। দুজনেই জন্মকাল ১৯২৫।

৮. ‘সুমনের গান, সুমনের ভাষ্য’ ১৯৮৪, কলকাতা, ধ্রুবপদ, ৬৯ পৃ.

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com